রাজনীতি ও নারীবিশ্ব : বাংলা কথাসাহিত্যে মানবী চেতনার নিহিত ভাষ্য

ড. অনন্য ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
হুগলি মহসিন কলেজ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ

ABSTRACT (নিবন্ধের সংক্ষিপ্তসার):
রাজনীতির অভিঘাতে আলোড়িত হয় ব্যক্তিমানুষ। রাজনীতির ঝোড়ো হাওয়া সমাজের চৌকাঠ ডিঙিয়ে প্রবেশ করে পরিবারের অন্দরমহলেও। তখন চির-অভ্যস্ত সংসার যাপনের দৈনন্দিনতা থেকে বেরিয়ে এসে পরিবারের নারীরা বহির্জগৎ ও বহির্বিশ্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জগৎ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়। একসময় নারী অর্জন করে রাজনৈতিক অভিজ্ঞান। রাজনৈতিক চেতনা দিয়ে তখন সে পরিপার্শ্ব, দেশ-কাল-সমাজকে নতুন করে চিনতে ও বিশ্লেষণ করতে শেখে। এভাবেই অন্তঃপুরচারিণী বাঙালি নারীরা রাজনীতির মধ্য দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। আবার রাজনীতির মধ্য দিয়েই নারী পেয়েছে বন্ধনমুক্তির দিশা। এই রাজনীতিই পুরুষশাসিত সমাজের ঘেরাটোপ থেকে মুক্তির জন্য প্রণোদিত করেছে নারীদের। কখনো মৃদুভাবে, কখনো সোচ্চারে তখন উচ্চারিত হয়েছে নারীর প্রতিবাদী স্বর। রাজনীতির সূত্রে নারীর রাজনৈতিক চেতনা অর্জন ও তারই মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয় নির্মাণের এই আখ্যান আমরা পাই রাজনৈতিক চেতনাদীপ্ত বাংলা কথাসাহিত্যে। যার মধ্যে সমকাল ও একালের মানবী-ভাবনার প্রতিবাদী ভাষ্য নিহিত রয়েছে।

*KEY NOTE ADDRESS (প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বিষয়ের সংকেত):
রাজনীতির সূত্রে নারীর আত্ম-অভিজ্ঞান অর্জন ও সেই সূত্রে নারীর আত্মপরিচয় নির্মাণের যে আখ্যান রাজনৈতিক চেতনাদীপ্ত কথাসাহিত্যে আমরা পাই তার মধ্যে নিহিত সমকাল ও একালের মানবী চেতনার যে প্রতিবাদী ভাষ্য রয়েছে তাকেই এই নিবন্ধের আলোচিত বিষয়ের মধ্যে দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

MAIN ARTICLE (মূল প্রবন্ধ):

সমাজ, রাজনীতির অভিঘাতে তার দ্বন্দ্ব ও মন্থনে আলোড়িত, বিক্ষত ও পীড়িত মানুষ যখন এক বিপন্ন অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন দেশ-কাল ও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে। এভাবেই গড়ে ওঠে রাজনীতি সচেতনতা। আরিস্টটল থেকে বিভিন্ন সময়ে সমাজ-বিজ্ঞানীরা মানুষকে রাজনৈতিক প্রাণী হিসেবেই দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন। কারণ এক অমোঘ চালিকাশক্তি হিসেবে রাজনীতি নানাভাবেই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রকৃতপক্ষে কোন মানুষই রাজনীতি থেকে বিযুক্ত থাকতে পারেন না। কারণ শুধু সামাজিক পরিসরেই নয়, রাজনীতির ঝড় আছড়ে পড়ে পরিবারের মধ্যেও। তখন কেবল পুরুষেরা নয়, ত্রস্ত পাখির মতো পরিবারের নারীরাও নির্ভুল ভাবে অনুমান করতে পারে আসন্ন দুর্যোগ ও সংবর্তকালের অশনি সংকেত। অন্তঃপুরের নিভৃত নিশ্চিন্ত গৃহিণীপণায় অভ্যস্ত মেয়েরা রাজনীতির ঝোড়ো হাওয়ায় তাড়িত ও আলোড়িত হয়ে হঠাৎই আবিষ্কার করে এক নতুন জগৎকে। এক ধ্বস্ত, টালমাটাল সময় চির-অভ্যস্ত সংসার যাপনের দৈনন্দিনতা থেকে নারীকে

নিয়ে আসে এক অচেনা পৃথিবীতে। তারপর প্রাথমিক বিপন্নতাবোধ কেটে গেলে নারী বুঝতে শেখে অস্তিত্বের সংকট যখন অবধারিত, তখন বেঁচে থাকার জন্য লড়াইটাও অনিবার্য। এভাবেই অন্তঃপুরচারিণী নারী রাজনীতির অভিঘাতে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে। অথবা রাজনীতিই তাকে নতুনভাবে নির্মাণ করে। গড়ে তোলে নারীর আত্মপরিচয় অর্জনের এক ভিন্ন ইতিহাস।

উনিশ ও বিশ শতকের রাজনীতির ইতিহাসে যেভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই উপেক্ষিত থেকে গেছে নারীর আত্মত্যাগ, বীরত্ব ও সংগ্রামের কথা। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নারীর প্রকৃত ভূমিকা, সমাজ-প্রতিবেশের সঙ্গে তার সংঘাত ও লড়াইয়ের কাহিনি সঠিক তথ্যের অভাবে ইতিহাসে কোথাও স্পষ্টভাবে লেখা হয়নি।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে ইতিহাসের এই নীরবতাকে ভাষা দিয়েছেন সাহিত্যিকেরা। ইতিহাস মানে তো শুধু তথ্য আর ঘটনাপঞ্জির বিবরণ নয়। তথ্যের অতিরিক্ত মানবজীবনের মর্মস্পন্দনের কাহিনিও থাকে ইতিহাসের পাতায়। নারীজীবনের সেই সংগুপ্ত ইতিহাসকেই সমকালের প্রেক্ষাপটে রূপ দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের কথাকাররা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় মানবী-চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। ক্রমে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজস্ব বোধ ও চেতনার সাযুজ্যে নারী অর্জন করেছিল আত্মপরিচয় ও আত্ম-অভিজ্ঞান। সন্তানপালন, প্রাত্যহিক গৃহকর্ম ও স্বামী-শুশ্রূষা ছাড়াও নারী বরাবরই খুঁজতে চেয়েছে নিজস্ব 'আইডেন্টিটি'। পিতৃতন্ত্রী নন্দনতত্ত্বের গণ্ডি অতিক্রম করে পেতে চেয়েছে নিজস্ব ভাষা ও পরিসর। আমাদের ভারতীয় সমাজ বহুদিন পর্যন্ত নারীর আত্মবিকাশের পথকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাজনীতির মধ্য দিয়েই নারীরা পেয়েছিল বন্ধনমুক্তির দিশা। বলা যেতে পারে রাজনীতিই তাদের পৌঁছে দিয়েছিল সামাজিক মুক্তির সীমানায়।

উনিশ শতকের ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসগুলির মধ্যে নানাধরণের রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা ও কাহিনির সূত্রে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উল্লেখ পাই আমরা। এক্ষেত্রে নারীর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া ও সেই সূত্রে তার ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও বিপর্যয়ের অকথিত নীরব ইতিহাসকে বাঙময় করে তুলে সাহিত্যিকেরা প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিকের দায়িত্বই পালন করেছেন।

উনিশ শতক থেকেই নানা ধরণের ইংরেজ-বিরোধী গণ-অসন্তোষ ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ভারতবাসীর মনে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়েছে। ইংরেজ বিরোধী এই সব গণ-বিদ্রোহগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তিতুমীরের বিদ্রোহ, ফরাজী আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, পাবনার প্রজাবিদ্রোহ প্রভৃতি। সরাসরি এই বিদ্রোহকে 'রাজনৈতিক' আখ্যা না দিলেও অবশ্যই নবজাগ্রত রাজনৈতিক চেতনা এই বিদ্রোহের উদ্দীপক হিসেবেই কাজ করেছিল।

এর মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল বহু আদিবাসী নারী। নীল বিদ্রোহেও গ্রামের প্রান্তিক কৃষক পরিবারের মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়াই করেছে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে। আর সিপাহী বিদ্রোহের 'সবচেয়ে সাহসী ও সর্বশ্রেষ্ঠ সমর নায়ক' ছিলেন একজন নারী-লক্ষ্মীবাঈ। উনিশ শতকের ঐতিহাসিক উপন্যাসে সিপাহী বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। কিন্তু সেই সময়কার ব্রিটিশভক্ত বাঙালি লেখকেরা সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি। তাই এই বিদ্রোহের সবথেকে বেশি আলোচিত ঝাঁসির রাণির প্রতি তাঁরা ক্ষোভ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ করে 'কুলটা', 'দুশ্চরিত্রা' বলেও অভিহিত করেছেন।

তবে বরদাকান্ত সেনগুপ্তের 'হেমপ্রভা' উপন্যাসে এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চন্দ্রা' উপন্যাসে ঝাঁসির রাণির সাহসিকতা, বিদ্রোহ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির কথা প্রশংসিত হয়েছে।

উনিশ শতকে রচিত এই জাতীয় উপন্যাসগুলিতে নারীর রাজনৈতিক চেতনা ও বিদ্রোহের কাহিনি আমরা যেটুকু পাই তা অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। বিশ শতকের নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ, গান্ধীজি ও সহিংসপন্থী বিপ্লবীদের নেতৃত্বে ইংরেজ বিরোধী নানা গণ-আন্দোলনের অভিঘাতে লেখা হল অনেক রাজনৈতিক চেতনাদীপ্ত বাংলা উপন্যাস ও গল্প।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সমাজের বিপুল সংখ্যক নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় রাজনীতিতে। সরোজিনী নাইডু, অরুণা আসফ আলির নেতৃত্বদান, তাঁদের রাজনৈতিক জীবনচর্যা, কমলা দাশগুপ্ত, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সাহসিকতা, আত্মত্যাগ আর মরিয়া আবেগ-সর্বস্ব লড়াইয়ের কাহিনি প্রাণিত করেছিল প্রাত্যহিকতায় অভ্যস্ত ঘরকন্না করা বাঙালি মেয়ে ও গৃহবধূদের। আসলে সমাজ-রাজনীতি সম্পর্কে নিরন্তর প্রশ্নশীলতা ঘর থেকে নারীকে বের করে এনেছিল বাইরের বিস্তীর্ণ সমাজে। রাজনীতির মধ্য দিয়েই এই মেয়েরা খুঁজতে চেয়েছিল গৃহকোণ থেকে, সীমাবদ্ধ জগৎ থেকে বন্ধনমুক্তির দিশা।

বাংলা কথাসাহিত্যে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, রাজনীতির আবর্তে বদলে যাওয়া নারীর জীবন-কথা এসেছে নানাভাবে। একদিকে চির-অভ্যস্ত গৃহস্থালি, সুস্থিত পারিবারিক জীবন, অন্যদিকে সমাজবোধ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় অর্জিত রাজনৈতিক আদর্শ, একদিকে পারিবারিক জীবন আর অন্যদিকে রাজনৈতিক জীবন— এই সবের দ্বন্দ্ব ও মিথস্ক্রিয়ায় নারীর মধ্যে তৈরি হওয়া নানা প্রশ্ন, সংশয় ও স্ববিরোধিতার কথা এসেছে বাংলা রাজনৈতিক চেতনাদীপ্ত কথাবিশ্বে। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক আদর্শ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্বে, নানা বিপ্রতীপ রাজনৈতিক মতবাদের স্রোতে কিভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তারা তারও বাস্তবসম্মত রূপটি ফুটে উঠেছে সাহিত্যিক বয়ানে। আবার একই সঙ্গে এই নারীদের রাজনীতিচর্চা, দেশপ্রেম ও মরিয়া আবেগ কীভাবে সাধারণ নারীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেছে আর সেই স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত চেতনার সূত্রে নারী কেমন করে নিজের সামাজিক অবস্থানটিকে নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে কিংবা ব্যক্তিগত মত ও স্বরকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-রাজনীতির কাঠামোর বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়ে উঠছে— তারও স্বাক্ষর রয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যের এই রাজনৈতিক চেতনাদীপ্ত আখ্যানগুলিতে।

স্বদেশি আন্দোলন আর বঙ্গভঙ্গের তীব্র অভিঘাত কিভাবে অভিজাত শিক্ষিত বাঙালি পরিবারের মেয়েদের উদ্দীপ্ত ও বিচলিত করেছিল তার ছবি রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। এই আন্দোলনের 'উত্তেজনা' ও 'হুজুগ' কবির কাছে অস্বস্তিদায়ক ছিল। তবু ভ্রান্তদর্শী তিনি নিশ্চিতভাবেই অনুমান করেছিলেন স্বদেশি আন্দোলন ও সমকালীন রাজনীতি শিক্ষিত বাঙালি মেয়েদের মনোজগতে নিয়ে আসছে এক বিপুল পরিবর্তন। বুঝেছিলেন, কেবল ঘরে নয়, বাইরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেই এবার নারীকে জায়গা করে নিতে হবে। আসলে নিখিলেশ নয়, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উচ্ছ্বসিত দেশপ্রীতি ও রাজনৈতিক উত্তেজনাই বিমলাকে গৃহকোণ থেকে বাইরে নিয়ে এসেছিল। এটাই ছিল সমকালীন যুগ ও রাজনীতির দাবি। 'বাইরেতে আসার দরকার কি'? বিমলার এই প্রশ্নের উত্তরে নিখিলেশ সঠিকভাবেই বলেছিল 'তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে।'

বিমলা শুধু সন্দীপ আর নিখিলেশের রাজনৈতিক আলোচনাই শোনেনি, অনেক সময়েই সে রাজনীতি প্রসঙ্গে তার মতামত দিয়েছে। তার সেই মতামতের মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক প্রতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা হয়নি অবশ্য। কারণ নিখিলেশ বা সন্দীপ কেউই রাজনীতি প্রসঙ্গে তার বক্তব্যকে গুরুত্ব দেয়নি। বিমলা নিশ্চিতভাবেই অনুভব করেছিল রাজনীতিতে শেষ কথা পুরুষই। সেখানে নারীর ব্যক্তিগত মতামতের কোন মূল্য নেই। এজন্য হয়তো তার প্রচ্ছন্ন অভিমান ছিল। কিন্তু নিজের বক্তব্যকে সে কখনই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেনি। দুই পুরুষের রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কের মধ্যে হারিয়ে গেছে তার নিজস্ব স্বর।

বিমলা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। 'চার অধ্যায়'এর এলা কিন্তু বিপ্লবীদের দলে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল। ইন্দ্রনাথ তাকে বলেছিল : 'তুমি সমাজের নও, তুমি দেশের।' দেশের জন্যই এলা তার হৃদয়ের দাবিকে অগ্রাহ্য করেছে। অতীনকে ভালোবাসলেও তাকে এড়িয়ে গেছে। এর কারণ বিপ্লবী দলনেতা ইন্দ্রনাথের প্রভুত্বকামী মানসিকতা। ইন্দ্রনাথের শাসন ও ও নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাহ্য করে অতীনের প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে সে। বিপর্যস্ত হয়েছে তার স্বাভাবিক জীবন। রাজনৈতিক দলের কঠোর কঠিন শৃঙ্খলা নারীর ব্যক্তিজীবন ও আত্মবিকাশের পথে কিভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তারই শোচনীয় পরিণাম দেখি এলার ব্যর্থ প্রেমের কাহিনির মধ্যে।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের 'পথের দাবী' সামাজিক সংগঠনের আড়ালে প্রকৃতপক্ষে একটি রাজনৈতিক সংগঠন। এই সংগঠনের সভানেত্রী উপন্যাসের নায়িকা সুমিত্রা। সুমিত্রা আদর্শবাদী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের শীর্ষ নেত্রী হিসেবে সেকালের বাঙালি মেয়েদের ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তারই দৃষ্টান্ত হল এই সুমিত্রা।

তবে রাজনীতির কারণেই সুমিত্রার ব্যক্তিগত জীবনের স্বপ্ন-সাধ পূরণ হয়নি। সব্যসাচীকে ভালবাসলেও তাকে পায়নি সে। বিপ্লবের পথ আর সংসারের পথ এক নয়— একথাই তাকে বুঝিয়েছিল সব্যসাচী। বিপ্লবী নেতা সব্যসাচী সংগঠনের প্রয়োজনে সুমিত্রাকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার প্রেমকে স্বীকৃতি দেননি।

'চার অধ্যায়'-এ অতীন্দ্র বলেছিল 'স্বভাবকে হত্যা করা পাপ।' এলা, সুমিত্রা দুজনেই রাজনীতির কারণে নিজেদের হৃদয়ের স্বাভাবিক চাহিদাকে, 'স্বভাব'কে হত্যা করেছিল। রাজনীতি ও প্রেম একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক হয়ে উঠতে পারে তা বোঝেনি তারা।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসের মা নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমরা বামুনের ঘরের বারব্রত করা মেয়ে'। বলেছিলেন, 'আমার যা কিছু বিলু আর নীলু। এর বাইরে আর কোন জগৎ নেই।' স্বামী রাজনীতি করলেও রাজনৈতিক তত্ত্ব বা বক্তৃতা তাঁকে আকর্ষণ করেনি কখনো। বরং তীব্র অভিমানে স্বামীর কাছে মনে মনে অনুযোগ করেছেন : 'তোমার সখ গান্ধীজীর সেবা করা...আমার কথা, ছেলেদের কথা একবারও ভেবেছ!'[1]

কিন্তু যাঁর দুই সন্তান, স্বামী সকলেই রাজনৈতিক কর্মী তিনি কি করে আর রাজনীতির বাইরে থাকতে পারেন! স্বামীর অনুগামিনী হয়েই তিনি কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবিকার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। উত্তাল ভারতছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে 'আওরত কিতা'য় বন্দি থেকেছেন। তবে রাজনীতি করতে গিয়েই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এক নতুন জগতকে। রাজনীতিই সংসারের সংকীর্ণ জগৎ থেকে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল এক বৃহত্তর জগতে, যেখানে থেকে তিনি বলতে পারেন :

> 'আমি রাজ্যশুদ্ধ লোকের মা, জেলের সব
> কংগ্রেস কর্মীর মা, আমার তো বিশ্বজোড়া

ছেলে।’[২]

মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাসের সুজাতাও এক সুস্থিত সংসার জীবন যাপনের স্বপ্নই দেখেছিল। কিন্তু সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে গিয়ে পুত্র ব্রতীর মৃত্যু সুজাতাকে নিশ্চিন্ত গৃহকোণ থেকে নামিয়ে এনেছিল এক অচেনা পৃথিবীতে। যেখানে ‘শ্রেণিশত্রু’, ‘সমাজবদল’, ‘বিপ্লব’— ব্রতীর কাছ থেকে শোনা এই শব্দগুলিকে তার মৃত্যুর পর এক নতুন তাৎপর্যে আবিষ্কার করেছিল সুজাতা। সুজাতা একসময় উপলব্ধি করেছিল, পুত্র ব্রতীর মৃত্যু হলেও তার স্বপ্নপূরণের দায়ভার বহন করতে হবে তাকেও।

বাংলা কথাসাহিত্যের আখ্যানে নারীদের রাজনৈতিক চেতনা অর্জন ও রাজনীতির অভিঘাতে আলোড়িত নারীদের কাহিনি প্রসঙ্গে আমরা দেখি যে, রাজনীতিই এই নারীদের দিয়েছিল জগৎ ও জীবনকে দেখা ও তাকে বিশ্লেষণ করার নতুন দৃষ্টি। আবার রাজনীতি করতে গিয়েই এই নারীরা দেখেছে আর এক ভিন্ন গোত্রের রাজনীতিকে। যেখানে পুরুষ নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব বজায় রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় নিজের স্বার্থে।

বিমলা, এলা, সুমিত্রা, সুজাতা এবং জাগরীর বিলু-নীলুর মা— সকলের চিন্তাবিশ্ব ও কথনবিশ্বে চেতন ও অবচেতনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে পুরুষতন্ত্রের প্রতি একধরণের অনুচ্চারিত, অবদমিত প্রতিবাদ ও দ্রোহ। এই নারীরা দেখেছে রাজনীতিতে দল পরিচালনা, নীতিনির্ধারণ সবেতেই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য পুরুষের। পুরুষতন্ত্র শিখিয়েছে, নারীর কোন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চিন্তা ও উচ্চারণ থাকতে পারে না। বিমলা সন্দীপের, এলা ইন্দ্রনাথের আর সুমিত্রা সব্যসাচীর রাজনৈতিক মতকেই নিজের আদর্শ ও মত মনে করেছিল। অনেক পরে বুঝেছিল, আসলে পুরুষের রাজনৈতিক প্রয়োজনেই বারবার ব্যবহৃত হয়েছে তারা। আমাদের মনে পড়বে এক্ষেত্রে, স্বামীর রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি অনুগত জাগরী উপন্যাসের মায়ের স্বগতোক্তি। এই মনোলগ আসলে তীব্র শ্লেষমথিত একটি উচ্চারণ, যা পুরুষতন্ত্রী সমাজের আড়ষ্ট চেতনাকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়ে যায়—

‘তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্য সব ছেড়েছো
সত্যি— কিন্তু আমাকে তো একটুও
স্বাধীনতা দাওনি।’[৩]

REFERENCE (তথ্যসূত্র)

১. ভাদুড়ী সতীনাথ, জাগরী, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৪২১, পৃ. ২০
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

REFERENCE BOOK (সহায়ক গ্রন্থ)

১. চৌধুরি নাজমা জেসমিন, বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, প্রথম প্রকাশ, ২য় সংস্করণ, ঢাকা বাংলা একাদেমি, ১৯৮০
২. বসু স্বপন, গণঅসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭, পুস্তক বিপণি, কলকাতা